Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.08-16
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

পুরুলিয়ার জন-শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষায় ভাদু পরবের ভূমিকা

সুদীপ্ত মাহাত
গবেষক, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উজ্জ্বল কুমার পাণ্ডা
অধ্যাপক, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, সিকম স্কিলস ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সমীররঞ্জন আধিকারী
অধ্যাপক, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, সিধো-কানহু-বীরসা ইউনিভার্সিটি,বোলপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Purulia is a very beautiful district of West Bengal – Rupasi Bengala. In general, the soil of Purulia is rough-dry and hard, but till the natural beauty of this district catches not only the eyes of the artists but of the common people also. Here in this district there are 13 Parbans (festivals) in 12 months; the life of the people here cannot be imagined without the festival. Among those Bhadu is a popular folk-festival of Purulia; according to the folk-researchers, this festival is about 800 years old. Through the observation of this festival, various hopes and aspirations of women's life are expressed for the fulfilment. According to Bengali almanac, this festival starts from the first day of the month Bhadra in every year and ends on the last day of the same month. Village girls and women perform Bhadu Puja every evening with offering songs. The stories of Ramayana, Mahabharata and Puranas, along with the current social problems of women, are spread through the lyrics and music of these songs. Again, through these stories people's education is spread. There are many opportunities also to use these songs in modern education too.

Key words: Folk-Festival, Folk-Education, Folk-Researcher, Tusu, Bandana.

বর্তমান গবেষনার পটভূমি হল পুরুলিয়া। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর আরও অনেক জেলাগুলির মধ্যে পুরুলিয়া একটি অন্যতম। এখানে প্রকৃতি দানে অকৃপণ। পুরুলিয়ার এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যে কেবল শিল্পীর চোখেই ধরা পড়ে তা নয়; সাধারণ মানুষের চোখেও ধরা পড়ে। অবস্থান, ভূপ্রকৃতি ও অধিবাসীদের প্রকৃতি অনুযায়ী এই জেলার ভাষা, সংস্কৃতি, তথা লোক-সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ চরিত্র বর্তমান। আর তা-ই আবশ্যিকভাবে এই জেলার লোক-শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

এই পুরুলিয়া জেলার অধিবাসী হিসাবে বর্তমান গবেষক তার মাতৃভূমির লোক-সংস্কৃতি, পরব, লোক-উৎসব ইত্যাদি জন-শিক্ষাকে কেমনভাবে প্রভাবিত করে তার অনুসন্ধান করতে বিশেষ প্রেষনা অনুভব করে।

বর্তমান গবেষণা পরিচালনার জন্য পুরুলিয়া জেলাতে প্রচলিত বহুবিধ লোক-উৎসবের মধ্যে থেকে বিশেষ একটিকে বেছে নেওয়া হয়েছে – সে'টি হল ভাদু। এই লোক-উৎসবটিকে নিয়ে নিম্নলিখিত গবেষণা-প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে –

ভাদু পরবের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলি হল –

(অ) ভাদু পরব উদ্ভবের ইতিহাস আছে কি?

(আ) ভাদু পরব পালন করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে কি?

(ই) ভাদু পরবের পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে কি?

(ঈ) ভাদু পরবের মাধ্যমে জন-শিক্ষার প্রসার ঘটে কি?

(উ) আধুনিক শিক্ষায় ভাদু পরবের প্রাসঙ্গিকতা আছে কি?

গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান (Methodology): বর্তমান গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। বিশেষত আধেয় বিশ্লেষণ (Content Analysis) পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালিত করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি (Method of Data Collection): গবেষণার উপাত্ত (Data) সংগ্রহ করার জন্য দ্বিমুখি পথে অভিগমন (Approach) করা হয়েছে।

(অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary Data):পুরুলিয়া জেলার নানা স্থানে নানা গ্রামে গিয়ে বরিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, স্থানীয় ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে গভীর সাক্ষাৎকার (Deep Interview) বা আলোচনার মাধ্যমে প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণায় বিশেষ ভাবে চিহ্নিত লোক-উৎসবটিতে পালনীয় ক্রিয়া-অনুষ্ঠানগুলি বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

(আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary Data): প্রকাশিত পুস্তকাবলি, পূর্বকৃত গবেষণা পত্রাদি, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থাগার বা অন্যান্য স্থানে সংরক্ষিত নানা নথিপত্র সংগ্রহ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে গৌণ উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis): ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত ও নানা মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত গৌণ উপাত্তের বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ বর্ণনার একটি গবেষণা কৌশল হল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সামাজিক নিদর্শন, শিল্পকর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র ও অন্যান্য দৃষ্টিগ্রাহ্য মৌখিক ও লিখিত ডকুমেন্ট এই পদ্ধতিতে তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ (Data Collection and Information Analysis): ক্ষেত্রসমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যয়নের মাধ্যমে সংগৃহীত উপাত্তগুলি থেকে আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্য নিষ্কাষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল (Research Findings): এই অংশে উপাত্ত বিশ্লেষণ করার পর প্রাপ্ত ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হল। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে অনেক মানুষের সাথে কথা বলা হয়েছে, নানা তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। উপাত্তগুলিকে বিশ্লেষণ করার পর ফলাফলগুলি প্রাপ্ত হয়েছে।

ভাদু পরবের ইতিহাস বিশ্লেষণ: এই ক্ষেত্রে ডঃ সুভাষ রায়ের 'পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' (১৪২৫) নামক বইটি, দিলীপ কুমার গোস্বামী মহাশয়ের 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি' নামক বইটি, যুধিষ্ঠির মাজীর 'ভাদুগীতির ইতিকথা' (প্রথম খন্ড) বইটি এবং সুব্রত চক্রবর্তী মহোদয়ের 'ভাদু' বইটির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

ভাদু গান কবে বা কোথায় প্রথম গীত হয়েছিল সে নিয়ে আজও বিতর্কের শেষ নেই। অনেকের অভিমত পঞ্চকোট রাজা নীলমনি সিংহদেওই প্রথম ভাদু উৎসবের সূচনা করেন। নীলমনি সিংহের অভিষেককাল ১৮৫১ সাল।

পুরুলিয়া জেলার বিশিষ্ট লোক গবেষক স্বপন দাস জানিয়েছেন যে পঞ্চকোট রাজবংশের রাজা বিশ্বম্ভর শেখরের ভদ্রেশ্বরী নামে এক কন্যা ছিলেন। বিশ্বম্ভর শেখরের সময়কাল ১২২২ থেকে ১২৫৪ খ্রিষ্টাব্দ। সেই হিসেবে ধরলে ভদ্রেশ্বরী থেকে যদি ভাদু শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে তবে এই সঙ্গীত প্রায় ৮০০ বৎসরের প্রাচীন। গবেষক রামশঙ্কর চৌধুরী রামপ্রসাদী গানে ভাদু গানের সাদৃশ্য নির্ধারন করে অনুমান করেছেন এই গানের প্রাচীনতা তিনশো বছরের অধিক। যাই হোক এই সব আলোচনা থেকে ভাদু গান ঠিক কত বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল তার সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। তবে একথা বলা যায় যে, কাশীপুর রাজ পরিবারের ভাদু উৎসবের অনেক আগে থেকেই মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূমের কিছু অংশ, বর্ধমান জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঝাড়খন্ডের মানভূম সংলগ্ন অঞ্চলে ভাদু গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং তার প্রসার ও ব্যাপ্তি ছিল দীর্ঘ কয়েক শতক ধরে, যা আজও চলে আসছে।

অনেকের মতে, কাশীপুরের রাজা তাঁর বিবাহযোগ্য কন্যার বিয়ে ঠিক করেছিলেন ভিন দেশের রাজকুমারের সঙ্গে। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রী সহ বরবেশে রাজকুমার আসার পথে অসুস্থ হয়ে ভেদ বমি করে মারা যান। অন্য মতে, আসার পথে জঙ্গলে ডাকাত কতৃক বর ও বরযাত্রী আক্রান্ত হয়ে রাজকুমার মারা যান। ঘটনা শুনে মর্মাহত রাজকুমারী সহমরণে যান এবং জনমানসে সতীলক্ষ্মী কন্যা হিসেবে স্থান লাভ করেন। কেউ কেউ আবার মনে করেন কাশীপুরের রাজার মেয়ে ভাদু ছোটো বেলা থেকেই একা পুতুল নিয়ে রাত দিন খেলা করত। যাকে সে আদর করে ভাদু বলে ডাকত। এই পুতুলকে ঘিরে ছিল তার সাধনা বন্দনা সব কিছু। ঘটনা প্রবাহে ঐ কন্যা সন্তান অসুস্থ হয়ে মারা যান। রাজার অন্য কোনো সন্তান ছিল না। সম্ভবতই তিনি শোকে কাতর হয়ে পড়েন। জনশ্রুতি অনুযায়ী, ঐ মেয়ে রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, বাবা, ভাদু তোমার বাড়িতেই রয়েছে, তুমি তোমার মেয়ের সাথী পুতুলকে পালন কর। তখন থেকেই রাজার আদেশে মেয়ের স্মৃতিতে ভাদু উৎসব পালন শুরু করা হয়ে থাকে।

সুতরাং, ভাদু পরব উদ্ভবের ইতিহাস আছে।

ভাদু পরব পালন করার উদ্দেশ্য

দিলীপ কুমার গোস্বামী তাঁর 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি' নামক বইটিতে, যুধিষ্ঠির মাজী তাঁর 'ভাদুগীতির ইতিকথা' বইটিতে, ডঃ সুভাষ রায় তাঁর 'পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' নামক বইটিতে ভাদু পরব পালনের উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এক্ষণে প্রদত্ত হল।

ভাদুগান প্রনয়বর্জিত গান। নারী পুরুষের প্রেম-প্রনয় সব লোকগানেরই উপজীব্য। কেবলমাত্র ভাদু গানেই সর্বোতভাবে প্রেমবর্জিত। রাজনৈতিক বিষয়ালোচনা ভাদুগানে সর্বোতভাবে বর্জিত। নানা সময় লোকগান রাজনৈতিক প্রচারের বাহন হয়েছে, কিন্তু ভাদুগান সর্বদাই রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় বর্জন

করেছে। এক শ্রেনীর ভাদু গান ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে। বধূ নিপীড়ন, বাঙ্গালী জীবনের প্রধান অভিশাপ। মানভূমের সব লোকগানের অন্যতম উপজীব্য হল শাশুড়ি-ননদ প্রসঙ্গ। ভাদুগানেও শাশুড়ি-ননদের প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই উপস্থিত। ভাদু সন্তান দানের দেবী হিসাবে মহিলা মহলে পূজিত হন। সন্তান কামনায় অনেকে ভাদু পূজার মানত করেন। অনেকে সন্তান লাভ করার পর ভাদু পূজার আয়োজন করেন। মেয়েরা যে সমাজে অপাংক্তেয় নয় সেই বার্তা দিতেই এই ভাদুগানের সৃষ্টি। কন্যা সন্তান কামনায় ভাদু উৎসব পালন করা হয়ে থাকে। তবে, বর্তমান দিনে কেউ আর কন্যাসন্তান কামনায় ভাদু উৎসব করে না।

সুতরাং, ভাদু পরব পালন করার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আছে।

ভাদু পরবে পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান: দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত 'অহল্যাভূমি পুরুলিয়া' তৃতীয় পর্ব বই-তে স্বপন দাস 'মানভূমের ভাদুগান' লেখাটিতে ভাদু পরব পালন সম্বন্ধে জানা যায়। ভাদু উৎসব ভাদ্র মাসের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ একমাস ধরে পালন করা হয়। এই পূজার বিশেষ কোনো পদ্ধতি নেই, নেই কোনো বিধি নিষেধ। এতে কোনো মন্ত্র তন্ত্রের বালাই নেই। গানই হল এই পূজার মন্ত্র। উপাচার ও আরাধনার একমাত্র উপকরন। ভাদ্র মাসের প্রথম রাতে নির্বাচিত একটি ঘরে কুমারী ও সধবা মেয়েরা মিলিত হয়ে ভাদুর আবাহণ করে থাকে।

প্রথমে সন্ধ্যারতি ও বন্দনাগীত গাওয়া হয়। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রথমেই গাওয়া হয় –

সাম দিলাম সলিতা দিলাম স্বর্গে দিলাম বাতিগো,
সব ঠাকুররা সন্ধ্যা লাও মা লক্ষ্মী-সরস্বতী গো।

এরপর বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে গান গাওয়া হয়। এই একই পদ্ধতি চলতে থাকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত। ভাদু সংক্রান্তির দু-তিন দিন আগেই ভাদুর মূর্তি ঘরে আনা হয়। মেয়েরা মূর্তি মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে তাদের প্রানের ভাদু ধনকে ঘরে নিয়ে আসে। ভাদু ঘরে আসার পর মেয়েদের তৎপরতা বেড়ে যায়। সংক্রান্তির আগের রাত্রে সারা রাত ধরে গান চলে। মিঠাই, জিলিপি, খাজা, বাতাসা প্রভৃতি ভাদুকে নিবেদন করা হয়। সেদিন দেখা যায় মিষ্টির দোকানদারেরও ফুরসৎ নেই। জিলিপি, মিঠাই, খাজাগুলি সেদিন তৈরি হয় অনেক বড় আকারের। সুতো বেঁধে দোকানে ঝুলিয়ে রাখা হয় ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য। জিলিপি, খাজার উপর বোধ হয়, ভাদুমনির আকর্ষন বেশি।

সে রাত্রে মেয়েদের চোখে ঘুম থাকে না। এই রাতকে বলা হয় ভাদু জাগরণের রাত। সারা রাত গান গেয়ে তারা কাটিয়ে দেয়। সকাল হতেই বিসর্জনের ধূম। বেজে ওঠে বিদায়ের বাঁশি কোনো অলক্ষ্য থেকে। কিছুতেই দিতে চাইনা, তবুও উপাই নেয়। প্রানের ভাদুধনকে জানাতে হয় শেষ বিদায়। চোখের কোনের অশ্রু বিন্দু মনের গহনে আগামী বছরের ভাদুর আগমনের প্রত্যাশা নিয়ে ঝরে পড়ে নিজেরই অজান্তে। কুমারী মন গেয়ে ওঠে –

প্রাণের হায় কি হল?
হলের ভাদু জলে যাতে সাজিল।

সুতরাং ভাদু পরবে পালনীয় আচার-অনুষ্ঠান আছে।

ভাদু পরবের মাধ্যমে লোকশিক্ষা প্রসার

ভাদু পরবের মাধ্যমে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদির শিক্ষা লোকমুখে প্রসারিত হয়ে থাকে।

(অ) রামায়ণে প্রসঙ্গ: মানভূমের প্রচলিত ভাদু গানে রামায়ণের সম্পূর্ন কাহিনী না পাওয়া গেলেও বিভিন্ন ঘটনা গুলিকে নিয়ে একাধিক গানের সন্ধান মেলে। এইসব গানে এক্কেবারে মানভূমের মুখের ভাষা এবং বাস্তবতাই সমুজ্জ্বল।

রামায়নে রামের চরিত্রটি হল আদর্শ চরিত্র। রামের চরিত্রে আদর্শ পুরুষের গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। সেই পুত্রের বনবাসকালে মাতা কৌশল্যার হৃদয়টি দুঃখে বিদীর্ন হয়। সেই কথাই গানের মাধ্যমে উঠে আসে।

রাম ন কি রে বনে যাবি মাকে কেন বলোনা
মায়ের প্রাণে কি ধৈর্য ধরে ছাড়তে মন তো চায়না।
রাম ন কি রে বনে যাবি ফিরে দাঁড়া আঙ্গিনাতে
সম বছরের কথা রাম বলবে মায়ের সাক্ষাতে।
রাম ন কি রে বনে যাবি তোর সীতাকে সঙ্গে লে
তোর সীতার ভার সইতে এই জগতে আর কে আছে।
রাম ন কি রে বনে যাবি হাতে লে রে ধনুক বান
রাবণ করিবেক সীতা চুরি বিভীষণের অপমান।

রামায়ণের কাহিনী মানুষের কাছে এই ধরণের গানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। সেই সঙ্গে মানুষের কর্তব্য বোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ প্রভৃতির শিক্ষা লোক পরম্পরায় প্রবাহিত হতে থাকে।

(আ) মহাভারত প্রসঙ্গ: রামায়ণের মত মহাভারতেরও নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানভূমে প্রচলিত আছে নানান ভাদু গান। ডঃ সুভাষ রায় 'পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি বইটি থেকে পাই –

যুধিষ্ঠির দুর্যোধন পাশা খেলাতে বস্যেছে।
কপটেরি সেই খেলাতে ধর্মপুত্র হারেছ্যে।।
একে একে সকল রাজ্য হারিলেন ভাই যুধিষ্ঠির।
ভীম অর্জুন ভাই হারিলেন আর হারিলেন দৌপদী।।

এই গানটির মধ্য দিয়ে কবি মহাভারতের দ্যুতক্রীড়া অনুষ্ঠান সম্পর্কিত একটি বিশেষ কাহিনীকে উপস্থাপিত করেছেন। দুর্যোধণের ছলনায় বশীভূত হয়ে যুধিষ্ঠীর একে একে সমস্ত সম্পদ এবং পরিশেষে দ্রৌপদীর মত কুললক্ষ্মীকেও হারিয়েছেন। কবি এই ভাদুগানের মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলার করুন পরিণতির কথা প্রকাশ করেছেন। পাশা খেলা তো জুয়া খেলায়। এ খেলা নেশা ধরিয়ে দেয়। গ্রাম্য জীবনে জুয়া খেলা একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধির প্রকোপে পুরুষরা সর্বশান্ত হয় এবং তার দুর্দশা শেষ পর্যন্ত বহন করতে হয় নারীদেরকেই। তাই সমাজে জুয়া খেলার মতো কু'প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার ঘটে এই গানের মাধ্যমে।

কেশে ধরি পাখির মতন আনিল রাজপথে।
সবার মাঝে টান মারে দৌপদীর বসনেতে।।
জোড় হস্ত করে রানী হরি ডাকেন বারে বারে।

বিপদভঞ্জন মধুসূদন ভবের নামে কর পার।।
লক্ষ্মীবিলাস পাটের শাড়ি পড়িল দৌপদীর গায়ে।
যতই টানে ততই বাড়ে দুঃশাসন লজ্জা পায়।।

এখানে দৌপদীর বস্ত্র হরণের ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এই গানে সমাজের কাছে নারীর লাঞ্ছনা প্রকাশ পেয়েছে। লাঞ্ছিত হলে নারীকে ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে হয় - সমাজের কোনো ব্যক্তি সাধারণত তার দুঃখ ও দুর্দশা মোচনে এগিয়ে আসে না, বরং সমাজের অন্যান্যরা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বেশ মজাই লুটতে থাকে। নারী সম্মান, নারীর মর্যাদাবোধের জনশিক্ষা প্রচারিত হয়েছে এই গানের মাধ্যমে।

(ই) শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ: কৃষ্ণ ভক্তির বণ্যা বহে চলে পুরুলিয়ার পল্লীসমাজে। সুভাষ রায় মহাশয়ের 'পুরুলিয়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে পাই -

সকালে উঠিয়া গোপাল ধরি রানির আঁচলে।
দে মা ননী খাব আমি আমায় ননী দে বলে।।
কিসের জঞ্জাল করিস গোপাল ঝুঁক কেন বাপ সকালে।
ও নীলমনি দিব ননী ঘোল মহি দু আঁচলে।।

গানটি থেকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রসঙ্গ উঠে আসে। শিশুরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই মায়ের কাছে খাবার চেয়ে আবদার করতে থাকে। মায়ের সাথে সন্তানের এই দৈনন্দিন ঘটনার সাথে পৌরাণিক কাহিনীর মিল থাকায় পুরাণ কথার এই দিকগুলি জনশিক্ষার মাধ্যমে সহজেই মায়েদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে থাকে।

(ঈ) পুরাণ প্রসঙ্গ: নানা পৌরাণিক কাহিনীও উঠে এসেছে নানা ভাদু গানে। পুরুলিয়ার পাড়া থানার গ্রামে গ্রামে ভাদ্র মাসে মেয়েদের কণ্ঠে আজও শোনা যায় এই সকল ভাদু গান। সেরকমই একটি 'প্রহ্লাদ চরিত' কাহিনী। যেখানে দীর্ঘায়িতভাবে ভাদুর সুরে উঠে এসেছে হিরণ্যকশিপুরের পুত্র প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তির কথা। সমগ্র বিশ্বের এক ও অদৈত্ব ঈশ্বরের স্বরুপ বলে শ্রীকৃষ্ণকে মানা হয়ে থাকে। সেই কৃষ্ণের এক নিষ্ঠ ভক্ত হলেন প্রহ্লাদ। পৌরাণিক কাহিনীর এক অনবদ্য চরিত্র এই প্রহ্লাদ। তাঁর কাছে বিষ্ণুই চিরন্তন সত্য।

মহামায়া নাম তুমি পড় দিয়া মন।
দিবানিশি দুর্গানাম কর সংকীর্তন।।
শিশু বলে হেন কথা নাহি বল আর।
বিষ্ণুপদে বাঁধা সদা মানস আমার।।

আবার দক্ষরাজার যজ্ঞে কথাও আছে ভাদু গানে।

দক্ষ রাজা যজ্ঞ করেন, খবর দিলেন নারায়ণ।
শিবকে না হয় নিমন্ত্রন, দুর্গার হয় বিরস বদন।।

এই রকম বহু উদাহরণ আছে ভাদু গানে।

(উ) সামাজিক/সাংসারিক প্রসঙ্গ: সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ভাদু গান বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। নারী তার ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সমস্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে ভাদু গানের মধ্য দিয়ে।

গ্রাম্য জীবনে মেয়েদের শ্বশুর বাড়ির সমস্যা একটি চিরন্তন সমস্যা। অভাব-অভিযোগ, কলহ-বিবাদ প্রভৃতির মধ্য দিয়েই নারীকে স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে হয়।

আমরা যখন ছুটু ছিলাম।
টুপায় খাতম গুড়মুড়ি।
শ্বশুর ঘরের ই কি ধারা,
বাসী ভাতে নাই মুড়ি।

সকল পরিবারেই ভালোবাসার কেন্দ্রে থাকে কন্যা। তাই কন্যার জীবন নির্বাহে কোনোরূপ ত্রুটি না রাখার জন্য তার অভিভাবকগণ সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। কন্যাও পিতৃগৃহে সযত্নে ও সানন্দে জীবন নির্বাহ করতে পারে। যে মেয়েটি এতদিন বাবা-মায়ের কাছে সযত্নে লালিত পালিত হয়েছে। শ্বশুর বাড়িতে এসে ঘটে যাচ্ছে তার ব্যতিক্রম। অভাব আর দারিদ্রের ঘেরা টোপে বন্দিনী সেই বধূটি জীবন যখন বিষম হয়ে ওঠে তখনই তার মুখ থেকে শুনতে পায় হতাশার বাণী। ভাদুগানে তারই প্রকাশ ঘটেছে।

শ্বশুর ঘরে যাব নাই মা,
ধরে মারে শ্বাশুড়ি।
শাওড়িতে ধরে মারে,
শ্বশুর কিছু বলে না।
গুনের দেওর গাল দেয় গো,
জানে পাড়া পরগনা।

সকল কন্যারই থাকে পিতৃগৃহের মতই পতিগৃহেও সে সযত্নে লালিত পালিত হওয়ার আকাঙ্খা। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে তার আশা-আকাঙ্খা গুলি অপূর্ণই থেকে যায়।

এক পিঠ চুল আমার
পিঠের পরে রহে না।
শ্বাশুড়িতে তেল দেয় না,
চুলের যতন জানে না।

শ্বাশুড়ি যে তার মাথায় দেবার তেলটিও দিতে কার্পন্য করে সেটাও আর গোপন থাকে না। গ্রামের বধূর বহু কাঙ্খিত বাসনা হলো শ্বশুর বাড়ির স্নেহ। কিন্তু কবি গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে রমনির উপেক্ষার দিকটি এখানে উপস্থাপন করেছেন।

শ্বশুর ঘরের লোক এসেছে
হেই মা কিছু বলো না,
শাওড়িতে জানতে পেলে
আমার দিবে গঞ্জনা।

ঘরের বৌকে তো বেশিদিন বাপের বাড়িতে ফেলে রাখা যায় না। সংসারের কাজ আটকে যায়, তাছাড়া লোকনিন্দাও আছে। তাই যখন শ্বশুর বাড়ির লোক এসেছে তাকে নিয়ে যেতে, তার মনে ভয় হয়েছে যদি

তার বলা কথা গুলো মা জানিয়ে দেয় কিংবা খারাপ কিছু বলে বসে তাহলে পরিণাম হবে ভয়ংকর। তাই মাকে অনুরোধ করে বলেছে।

(ঊ) **সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ:** সাম্প্রতিক কালের প্রসঙ্গ নিয়ে যে সকল গান প্রচলিত আছে সেগুলিতে বিষয়বস্তুর কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম থাকতে দেখা যায় না - যে কোনো সাম্প্রতিক বিষয় নিয়েই তাৎক্ষনিকভাবে বেশ কিছু ভাদুগান রচিত হয়েছে। তবে সবগুলিই যে স্থায়িত্ব লাভ করে তা কিন্তু নয়।

এ কি কলি কালে,
রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে
ছিঃ ছিঃ কলি কালে।
দেশে হল নতুন আইন,
লতুন লতুন কথা বলে।
ভাইয়ের টাকা বোনে পায় লো,
আদালতে মামলা চলে।
ছিঃ ছিঃ কলি কালে।

মেয়েরাও ছেলেদের মতই বাবার বিষয় সম্পত্তির অংশ পাবে এমন আইন চালু হলে অনেক মেয়ে বাঁটোয়ারা চেয়ে বসল। কোনো কোনো ভাই স্বেচ্ছায় দিল, আবার, অনেকেই দিল না। সেই না ভাগ পাওয়া জন্য বোনেরা আদালতের শরণাপন্ন হয়। ভাই-বোনের সম্পর্কে ফাটল ধরে। সাধারণ গ্রাম্য পরিবারের মেয়েরা সেই সব সম্পত্তি লোভী মেয়েদের নিন্দায় মুখরিত হয় - প্রতিবাদের সুর ধ্বনিত হয় এই ভাদু গানের মাধ্যমে।

এই ডি. ভি. সি. কে বাঁধল মানভূমেরই লোকে লোক।
পেটের ভাতের অভাব মিটবেক তাথেই ভুল্যেছে জমির শোক।

১৯৫৭ সালে ডি. ভি. সি. প্রতিষ্ঠার সময় স্থানীয় লোকজনদেরকে বোঝানো হয়েছিল এই বাঁধ তৈরি হলে আর তাঁদের অভাব থাকবে না, অগণিত মানুষ চাকরি পাবে। জমির পরিবর্তে মিলবে মোটা টাকা, যা দিয়ে তারা অন্যত্র বসতবাড়ি তৈরী করে নিতে পারবে। চাষের জন্য আর জলের অভাবও থাকবে না। সেই কথাই উঠে এসেছে এই গানটিতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। নামমাত্র টাকায় জমিজমা সবারই নিয়ে নেওয়া হল। স্থানীয় কোনো ব্যক্তিই চাকরি পেল না - বাইরের থেকে বাবুরা এসে শুরু করল শাসন এবং শোষন। তারই প্রতিচ্ছবি এই গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

ডাঙ্গা ভিটা জলে ডুবল্য আমরা সবাই খাব কি।
আগে লাগাতি বিলাতি বেগুন কত ফুলকপি আর বাঁধাকপি।

পণপ্রথা সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যা। এই পণের জন্য একটি কন্যার পরিবার সর্বশান্ত হবার দিকে অগ্রসর হয় তাই সরকার আইন করে পণ প্রথা উচ্ছেদ করেছে। পণপ্রথার বিরোধীতা করা হয়েছে এই ভাদু গানে।

অভাগা অবলা সকল দেশের যত কুমারী।
মন গুমানে আছে মর্যে পিতৃ মুখ লক্ষ্য করি

আর দুঃখ নাই পাত্রির রে তাদের দুঃখ হরি।
পণপ্রথা উচ্ছেদ হল্য উঠল দরাদরি।।

পুরুলিয়ার যুবতী মেয়েদের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকা ভাদু গানে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র দিকগুলি ফুটে ওঠে। শৌখিন বাঙালি সমাজেও বিয়েতে পণপ্রথা নামক এক কু-প্রথার ব্যাপক প্রচলন আছে। তার ভয়ংকর রূপ সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় প্রতিফলিতও হয়। এক সময়ের কন্যাপণ পরিবর্তিত হয়েছে বরপণে। এর ফলে পিছিয়েপড়া প্রান্তিক মানুষের পক্ষে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া জটিল হয়ে পড়ে। সমাজের পণপ্রথার মত মারাত্মক ব্যাধির কথা মেয়েদের গানে গানে উঠে এসেছে।

সুতরাং ভাদু পরবের মাধ্যমে জন-শিক্ষার প্রসার ঘটে।

১৩.২.৫ আধুনিক শিক্ষায় ভাদু: ভাদুর লোকাচার ও ভাদু গান গুলিকে পর্যালোচনা করলে যে মূল বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় সেগুলি হল নারীর সমাজ সচেতনতা, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদ ইত্যাদি।

আধুনিক স্কুল-কলেজ শিক্ষার পাঠ্যক্রমে ভাদুগান সম্পর্কে আলোচনা ও বিশ্লেষণ স্থান পেলে এর মাধ্যমে যে জনশিক্ষা প্রসারিত হয় তা আধুনিক শিক্ষাকেও ত্বরান্বিত করতে পারে। রামায়ণ, মহাভারত,পুরাণ ইত্যাদির কাহিনী ভাদুগানের মাধ্যমে লোকমুখে প্রচারিত হয় এবং আপামর জনতা সেগুলি শিখেও নেয়। আধুনিক সময়ে নারীদের সমস্যা গুলি নিয়ে গান বেঁধে প্রচার করতে পারলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

সুতরাং, আধুনিক শিক্ষায় ভাদু পরবের প্রাসঙ্গিকতা আছে।

সিদ্ধান্ত: পুরুলিয়া জেলায় লোক-উৎসব লোকায়ত জীবন থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। এই জেলায় বিচিত্র জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। তাই এই জেলাকে সংস্কৃতির লীলাভূমি বলাই যায়। এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের বেঁচে থাকার রসদ পায় এই সকল লোক-সংস্কৃতি থেকে। যেমন, সারা ভাদ্র মাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় চলতে থাকে ভাদু গানের মাধ্যমে ভাদু পূজা। আর এই সকল গানের মধ্যে দিয়ে প্রচারিত হতে থাকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের নানা কাহিনী; কখনও কখনও সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা, ইতিহাস ইত্যাদিও স্থান পায় ভাদু গানে। আর এই সব ভাদু গানের মধ্য দিয়ে আবহমান কাল ধরে জন-শিক্ষা প্রসারিত হতে থাকে। আধুনিক শিক্ষাতেও ভাদু গান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গ্রন্থ পরিচয়:

১. গোস্বামী, দিলীপ কুমার (২০১৬) 'সীমান্ত রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি' পরিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া- ৭২৩১০১
২. মন্ডল, ডঃ দয়াময় (২০১২) 'দক্ষিন পশ্চিম সীমান্ত বাঙলার টুসু-ভাদু ও ঝুমুর (সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়)' সত্যজিৎ সান্যাল প্রকাশক, কলকাতা-০৯।
৩. মাজী, যুধিষ্ঠির (২০১৬) 'ভাদুগীতির ইতিকথা (প্রথম খন্ড)' আসর পত্রিকা প্রকাশক, কলিকাতা-০৫
৪. রায়, ডঃ সুভাষ (১৪২৫ বঙ্গাব্দ) 'পুরুলিয়া ইতিহাস ও সংস্কৃতি' রায় প্রকাশন, বীরভূম- ৭৩১১০১
৫. মানভূম সংস্কৃতি – মানভূম কালচারাল আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০২০ জানুয়ারী।